CC - PS – 05

Q.তুলনামূলক রাজনীতি বলতে কি বোঝো ?

Ans.: তুলনামূলক রাজনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সেই শাখা যা তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে স্থান-কাল নির্বিশেষে একাধিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার আভ্যন্তরীন রাজনীতির তুলনামূলক আলোচনা করে। এই রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলি জাতীয়, অন্ত-জাতীয়, বা অতি-জাতীয় স্তরের হতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি বিশেষদিক হিসাবে তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনার সাধারণত তিনটি উদ্দেশ্য থাকে- (১) অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির সঙ্গে তুলনার ভিত্তিতে কোন বিশেষ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা। এই তুলনা সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলিকে নিয়ে বা তাদের কোন বিশেষ দিককে নিয়ে হতে পারে। (২) এইরূপ তুলনার মধ্যে দিয়ে কিছু ধারণা (concept) বা কোন প্রকল্প (hypothesis)-এর কার্যকরীতা বা প্রয়োগযোগ্যতা যাচাই করা, তা সে সচেতনভাবে হতে পারে, নাও হতে পারে। এই ধারণা বা প্রকল্পগুলির উৎস রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা, বৃহত্তর সমাজবিজ্ঞান, এমনকি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানও হতে পারে। (৩) দূরগত উদ্দেশ্য অবশ্যই রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলিকে বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহারযোগ্য তাত্ত্বিক কাঠামোর সন্ধান করা। তবে বাস্তবে দেখা গেছে যে এই তিনটি উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রথমটিই বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। উপরের পর্যবেক্ষনগুলিকে ভিত্তি করে বলা যায় যে তুলনামূলক রাজনীতি হলো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সেই শাখা যা তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট থেকে বিশ্বের রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির তুলনামূলক বর্ণনা ও প্রয়োজনে বিশ্লেষণ করে।

Q. তুলনামূলক রাজনীতির বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করো ?

Ans.: তুলনামূলক রাজনীতির বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে Hans Daalder মন্তব্য করেছিলেন যে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার অনেক পূর্বেই 'তুলনামূলক রাজনীতি'র অস্তিত্ব ছিল ('Comparative Politics' existed long before it became a recognized subjected of the modern discipline of political science). Aristotle ছিলেন প্রথম তুলনামূলক রাজনীতিবিদ, যিনি আদর্শ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য সন্ধান করতে গিয়ে গ্রিক নগররাষ্ট্রগুলির সংবিধান ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলনা করে তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছোন। Plato Cicero-র লেখাতেও আমরা তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন পাই, যেমন পাই ইটালি ও ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির (Principalities) অভ্যন্তরে ও পারস্পরিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বের তুলনামূলক আলোচনায়। Bodin, Hobbes, Locke 3 Montesquieu-র লেখার মধ্যে তুলনার উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে Tocqueville, Marx, Bryce ও অনেকেই সচেতনভাবে তুলনাবিদ না হলেও, তাঁদের তত্ত্ব বা ধারণা সৃষ্টিতে কোথাও না কোথাও তুলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু, রাজনীতি চর্চার একটি পৃথক (স্বতন্ত্র না হলেও) এলাকা হিসাবে তুলনামূলক রাজনীতির উদ্ভব হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যখন রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা রূপে নিজের স্বকীয় অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে পারল। ইউরোপে অবশ্য তখনও রাষ্ট্রবিজ্ঞান আইনচর্চার একটি অঙ্গ হিসাবে পরিচিতির থেকে মুক্তি পায়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান যে গতিতে তার প্রতিষ্ঠাকে প্রসারিত করতে পারল, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষকদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করতে পারল, তুলনামূলক রাজনীতি সেই অনুপাতে সফলতা পেল না। এই অসম বিকাশের কারণগুলি খুঁজে পাওয়া যাবে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রনীতি ও জনমনস্তত্ত্বের মধ্যে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারক ও বৃহত্তর মার্কিন সমাজের একটি সর্বব্যাপী বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট জাতি হিসাবে মার্কিনিদের ভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থাগুলিকে না জানলে বা বুঝলেও চলে, ও অপরাপর রাষ্ট্রগুলির উচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করা বা প্রয়োজনে অনুকরণ করা। অনেকাংশে এইজন্যই সেই সময়ের মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠক্রম ছিল প্রধানত মার্কিন রাজনীতিকে ঘিরে এবং যে অল্প কয়েকজন তুলনামূলক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মর্যাদা ও অবদান যথেষ্ট নিম্নমানের ছিল। অপরদিকে, ইউরোপীয় ভূখণ্ডের রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চার আইন-নির্ভরতার দরুন তুলনামূলক রাজনীতিতেও খুব স্পষ্টত প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি প্রবণতা লক্ষ করা যায়। দুই মহাদেশেই বিদেশি শাসনব্যবস্থার আলোচনা, যা তুলনামূলক রাজনীতির কেন্দ্রীয় বিষয়, ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকলেও (যদিও ইউরোপে অনেক বেশি ছিল) তার মূল। বিচার্য বিষয় ছিল সংবিধান, সরকার ও তার তিনটি বিভাগ, আইন ও আইনি ব্যবস্থা, ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল। এই আলোচনাগুলি অগ্রসর হত হয়। ইতিহাসের না হয় আইনের পথে, বা উভয়ই। আলোচনার এই সরকার-কেন্দ্রিকতার জন্য ঐ সময়ের তুলনামূলক রাজনীতি চর্চাকে তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা (Comparative Government) বলা অবাঞ্ছিত হবে না।

Q.তুলনামূলক রাজনীতির পরিধি সম্পর্কে আলোচনা করো ?

Ans.: তুলনামূলক রাজনীতির পরিবর্তনশীল চরিত্র তার বৌদ্ধিক বিবর্তনের মধ্য দিয়েই প্রতিভাত হয়, যার স্পষ্ট রূপ দেখতে পাওয়া যায় বিষয়টির পরিসরের পরিবর্তনে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনা ক্ষেত্রের বিস্তৃতি-সংকোচন ঘটেছে যাকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করে বিচার করা যায়। প্রথম পর্যায় এই পর্যায়ের সময়সীমা হিসাবে নির্দিষ্ট করা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত। অষ্টাদশ শতকে ফরাসি বিপ্লবের স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্রের আদর্শ ও শিল্পবিপ্লবের ফলশ্রুতি রূপে পুঁজিবাদের সম্প্রসারণ পশ্চিমি দুনিয়ার রাজনীতিতে মধ্যযুগীয় অপরিবর্তনীয়তার স্থানে দ্রুত ও মৌল পরিবর্তনের হাওয়া নিয়ে আসে। জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও পুঁজিপতি শ্রেণির শ্রেণিগত স্বার্থে রাজনৈতিক শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন অতীতের সাম্রাজ্যভিত্তিক রাষ্ট্রগুলিকে ভেঙে দিয়ে আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি করল। এই নতুন ধরনের রাষ্ট্ররূপ স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নবজাতক জাতীয় রাষ্ট্রগুলির শাসনতান্ত্রিক কাঠামো, বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যাবলি ও আন্তঃসম্পর্ক, রাজনীতির গণতান্ত্রিকীকরণের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে এক নতুন ধরনের রাষ্ট্রতত্ত্বের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি শাসনের স্থানে আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে রাষ্ট্র-পরিচালনায় নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান-উদ্ভূত আইন (যথা সাংবিধানিক, সংসদীয় বা প্রশাসনিক) কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করতে থাকার জন্য রাষ্ট্র-সংক্রান্ত আলোচনায় আইন ও প্রতিষ্ঠান-নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, এই প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক আলোচনাই জন্ম দেয় ইতিহাস ও আইনাশ্রয়ী দৃষ্টিভঙ্গিকে, যার প্রাথমিক প্রয়োগ দেখা যায় সাধারণভাবে রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনায়। ১৮৪৭ থেকে ১৮৯২ সালের মধ্যে প্রকাশিত Wilhelm Roscher-এর Politik, Theodore Woolsey- Political Science or The State Theoretically and Practically Considered (1878), এবং Woodrow Wilson-এর The State : Elements of Historical and Practical Politics: A Sketch of Institutional History and Administration (1895) প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সম্ভবত প্রথম তিনটি ফসল। পরবর্তীকালে বিদেশি শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনায় এই প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক ও বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করা হয়, তা সে কোনো একক রাজনৈতিক ব্যবস্থার বা একই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত একাধিকের সম্বন্ধেই হোক না কেন। তুলনাবিমুখ, বর্ণনামূলক এই ধরনের আলোচনার অন্যতম আদি প্রচেষ্টা ছিল ।

দ্বিতীয় পর্যায় :- তুলনামূলক রাজনীতির পরিধি পরিবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায়কে আমরা ঐ বিষয়ের সম্প্রসারণের যুগ বলতে পারি— যে সম্প্রসারণ একই সঙ্গে ভৌগোলিক ও বৌদ্ধিক । সময়ের মাপকাঠিতে এই যুগের সূত্রপাত ১৯৫০-এর দশকের প্রথমদিকে, যদিও তার বৌদ্ধিক প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়েছিল পূর্বেই এবং প্রায় অপ্রতিহতভাবে চলে ১৯৮০-এর মধ্যভাগ পর্যন্ত। তুলনামূলক রাজনীতির ভৌগোলিক অর্থে পরিধির বিস্তার ঘটে যখন এই পর্যন্ত ইউরোপের বা পশ্চিমের উন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা তুলনাবিদরা আগ্রহী হয়ে ওঠেন সদ্য স্বাধীন হওয়া তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির রাজনীতিতে। বাস্তবে, তাঁরা উন্নত দুনিয়ার রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলিকে উপেক্ষাই করতে শুরু করেন। একাধিক কারণে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছিল। যেমন আচরণবাদী বিপ্লবের ফলে পশ্চিমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সার্বজনীনতার দিকে ঝোঁক, American Social Science Research Council- Committee on Comparative Politics-এর পক্ষ থেকে তুলনামূলক রাজনীতির গবেষণাকে পৃথিবীর সকল প্রান্তে বিস্তৃত করার সংগঠিত প্রচেষ্টা ও সর্বোপরি, 'নতুন' রাষ্ট্রগুলির রাজনীতি সম্বন্ধে মার্কিন প্রশাসনের সম্যক ধারণা সৃষ্টির প্রয়োজন। বৌদ্ধিক দিক দিয়ে সম্প্রসারণের নির্দেশক ছিল দেশ-কাল নির্বিশেষে ব্যাপকতন তুলনার উদ্দেশ্যে সার্বজনীন তাৎপর্যের ধারণাকোষ সৃষ্টি ও সম্ভাব্য গবেষণার দিক- নির্দেশক, সার্বজনীনভাবে প্রযোজ্য তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ। যাঁরা এই বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রচলিত পরিভাষা একান্তভাবেই ইউরোপের রাজনৈতিক বাস্তব প্রসূত, যার দ্বারা ভিন্ন প্রকৃতির রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা কেন, বর্ণনাও করা যায় না। তুলনার লক্ষ্যবস্তু, অর্থাৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংখ্যা ও বৈচিত্র্য প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধির সঙ্গে

সমানুপাতে তথ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য তথ্য-নির্বাচন, বিন্যাস ও পরিবেশন এবং সেই তথ্যের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তুলনামূলক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন ছিল তাত্ত্বিক কাঠামোর। তাই, ১৯৫০-এর দশকে যেমন কয়েকটি নতুন তাত্ত্বিক কাঠামো, যথা David Easton-এর ব্যবস্থাপক দৃষ্টিভঙ্গি (Systems Approach), Gabriel Almond-এর কাঠামো কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গি (Structural Functional Approach) ও Kari Deutsch-এর যোগাযোগ তত্ত্ব (Communications Theory), তেমনই রাজনীতির কিছু নতুন পরিভাষা যার প্রয়োগযোগ্যতা অনেকাংশেই সার্বজনীন।

তৃতীয় পর্যায় :- তুলনামূলক রাজনীতির দ্বিতীয় পর্যায় যদি সম্প্রসারণের হয় তাহলে তার তৃতীয় ও শেষ পর্যায় অনেক অর্থেই সংকোচনের। দ্বিতীয় পর্যায়কে তার বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনীতিকে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে যুক্ত করার বাস্তববাদিতা, নতুন পরিভাষা-কোষ, তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ, গবেষণার প্রতি ঝোঁক ইত্যাদির জন্য তুলনামূলক রাজনীতির 'স্বর্ণযুগ' হিসাবে চিহ্নিত করলেও কতকগুলি সমস্যা বা দুর্বলতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। প্রথমত, Commitee on Comparative Politics-এর সভাপতি Gabriel Almond ও তাঁর বৌদ্ধিক সহযাত্রীরা বাস্তববাদিতার যুক্তিতে রাজনীতি ও তার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রকে সামাজিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে বিচার করেন, এবং রাজনীতির চরিত্র নির্ধারণে রাষ্ট্র ও তার প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকাকে কার্যকরীভাবে অস্বীকার করেন। কিন্তু বাস্তব বহুমুখী হওয়ার ফলে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই Almond-গোষ্ঠীর রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভূমিকা সম্বন্ধে অবস্থানকে সমালোচনা করা যায়। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ও ক্ষমতার প্রতিভূ হিসাবে রাষ্ট্রের তিন হাজার বছরেরও বেশি একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে, যদিও তার রূপ, কার্যাবলি ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্কের চরিত্র স্থান ও কালের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৫০-এর শুরুতে যে দেশীয় রাজনীতিগুলিকে দেখে 'বাস্তববাদী' তুলনাবিদদের মনে হয়েছিল যে সামাজিক শক্তি রাষ্ট্রীয় শক্তির চেয়ে বেশি, সেগুলি ছিল তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের সদ্য-স্বাধীনতা পাওয়া দেশ— যেখানে দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের জন্য ও তার বিরুদ্ধে দেশীয়

সমাজগুলি একপ্রকার মহনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার ফলে সামাজিক গোষ্ঠী ও আন্দোলনগুলি শক্তি সঞ্চার করে। অপরদিকে, ঔপনিবেশিক শাসনের উত্তরসূরি স্বাধীন রাষ্ট্র তখনও প্রায় সদ্যোজাত, অনেকক্ষেত্রেই যার কর্তৃপক্ষের শাসক হওয়ার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু মানসিকতা ছিল না। কিন্তু এই উত্তরণকাল বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ইতিহাসের ধারা অনুযায়ী নবজাতক রাষ্ট্রগুলি স্বল্পসময়ের মধ্যেই একটি স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ও কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অধিকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ও সকল সামাজিক শক্তির ক্রিয়া- মিথস্ক্রিয়ার মঞ্চ রূপে সমাজে নিজের অবস্থানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। সাবেক পশ্চিমি রাজনৈতিক দুনিয়ায় কিছু কিছু বাহ্যিক পরিবর্তন সত্ত্বেও রাষ্ট্র এই ভূমিকাতেই ছিল, পরে তার সঙ্গে যুক্ত হয় 'নতুন' রাষ্ট্রগুলি। রাজনীতিতে রাষ্ট্রের এই ইতিহাসগতভাবে কেন্দ্রীয় ভূমিকাকে স্বীকার করে ও একই সঙ্গে তথাকথিত বাস্তববাদী তুলনাবিদদের ধারণাকে সমালোচনা করে Theodore Skocpol তাঁর 'রাষ্ট্রের প্রত্যাবর্তন' বা 'Bringing the State Back In-এর ধারণাকে প্রকাশিত করেন ১৯৮৫ সালে (P. B. Evans, D. Rueschmeyer & T. C. Skocpol, (eds). Bringing The State Back In, 1985)। ১৯৮০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে শুরু হওয়া এই তৃতীয় পর্যায়ের প্রধান প্রতিপাদ্য ছিল এই যে রাষ্ট্র রাজনীতিতে এখনও কেন্দ্রীয় ভূমিকায় অবস্থান করছে। এই তৃতীয় পর্যায়ে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ করা যায় প্রত্যক্ষভাবে তুলনার পরিধির প্রশ্নে। Almond ও তাঁর সহযোগীরা তুলনার যে ধারণার কাঠামো সচেতনভাবে সৃষ্টি করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বব্যাপী তুলনা, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকত একটি বা অল্প কয়েকটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে। কিন্তু, বর্তমান পর্যায়ের তুলনার প্রচেষ্টা স্পষ্টতই স্বল্পমাপেরবৃত্তের মধ্যে সীমিত, হয় কোনো একটি বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলে (যেমন পশ্চিম ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ইত্যাদি) বা অল্প সংখ্যক কয়েকটি দেশে। সুতরাং, পার্থক্যটি মূলত তাত্ত্বিক ব্যাপকতা ও প্রায়োগিক সূক্ষ্মতার মধ্যে। তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনার পরিধির এই পরিবর্তন প্রতিফলিত করে বৃহত্তর সমাজের পটভূমিকায় রাজনীতির চরিত্রের অধিক থেকে অধিকতর উদ্ঘাটনের চেষ্টাকে, যা রাজনৈতিক তত্ত্বের এলাকায় পূর্বেই দেখা গিয়েছিল। তারই সমান্তরাল প্রচেষ্টা আমরা দেখেছি তুলনামূলক রাজনীতিতে প্রথম পর্যায়ে রাজনীতির স্বাতন্ত্র্যকে তুলে ধরা, দ্বিতীয়ত রাজনীতির সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাজনীতিকে সামাজিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত হিসাবে ব্যাখ্যা করা, এবং তৃতীয় ও বর্তমান পর্যায়ে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের বিশ্লেষণের ধারা অনুযায়ী রাজনীতি ও সমাজের মিথস্ক্রিয়ার ধারণার মধ্য দিয়ে রাজনীতির, এক্ষেত্রে বিদেশি রাষ্ট্রের, চরিত্র বিচার করা

Q. তুলনামূলক রাজনীতি চর্চা সম্পর্কে আলোচনা করো ?

Ans.: সাম্প্রতিক কালে তুলনামূলক রাজনীতি চর্চা জনপ্রিয়তা লাভ করলেও প্রাচীন কাল থেকেই এই ধরনের আলোচনা চলে আসছে । রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক অ্যারিস্টটল এবং রাষ্ট্রদর্শনের জনক প্লেটোর আলোচনা পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয় । এঁদের পরবর্তী পর্বে মেকিয়াভেলী , বোঁদা , মন্টেস্কু প্রমুখ এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন । তবে নিশ্চিত ভাবেই প্রাচীন কালের তুলনামূলক পদ্ধতির সাথে আধুনিক তুলনামূলক রাজনীতি চর্চার সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে । প্রাচীন কালের তুলনা মূলক পদ্ধতি ছিল প্রাধনত বর্ণনা মূলক এবং মূল্যবোধযুক্ত । সেই সময়ে শধুমাত্র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন সরকার , সংবিধান প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হোত । আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই আলোচনা ইউরোপের দেশগুলোতেই সীমাবদ্ধ ছিল । তুলনামূলক রাজনীতিতে তত্ত্ব নির্মাণের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যের কারণগুলো ব্যাখ্যা করা হয় । একটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার পার্থক্যের কারণ , বিভিন্ন রাষ্ট্রে একই রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও তাদের মধ্যে পার্থক্যের কারণ বিশ্লেষণ করা হয় । তুলনামূলক রাজনীতিতে দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা একই রকম আবার সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চিনে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও তাদের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন , মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেন -দুটি দেশেই দ্বিদল ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও তাদের ভূমিকা ও কার্যকলাপ এক নয় - আধুনিক তুলনামূলক রাজনীতি এই সব প্রশ্নের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছে । আলমন্ড এবং তাঁর অনুগামীরা উন্নত ও উন্নয়নশীল এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার জন্য বিশেষ পদ্ধতি ও ধারণার প্রয়োগ করেছেন । তাঁরা রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ , রাজনৈতিক সামাজিকীকরন , নগরায়ন , আধুনিকীকরণ প্রভৃতি বিষয়কেও তুলনামূলক রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন । P তুলনামূলক রাজনীতি আন্তঃ বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করে নৃতত্ত্ব মনস্তত্ব , অর্থনীতি সহ সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সাহায্যে আলোচনা ও বিশ্লেষণকে আরো সঠিক ও বাস্তব সম্মত করে তুলতে আগ্রহী । ফলিত ও প্রায়োগিক - উভয় দিক থেকে তুলনামূলক রাজনীতিতে নতুন নতুন বিষয় যুক্ত হচ্ছে , গবেষণা ও তত্ব নির্মাণে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে যা এই বিষয়টির প্রতি নিঃসন্দেহে আগ্রহ ও গ্রহনযোগ্যতা বৃদ্ধি করছে ।

Q. তুলনামূলক আলোচনার উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা আলোচনা করো ?

Ans.: তুলনামূলক রাজনীতি হল একটি সাম্প্রতিক বিষয় । রাজনৈতিক আলোচনাকে অধিকতর বাস্তবসম্মত করে তোলাই এরূপ রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য । এরূপ রাজনীতিতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও আলোচনা পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতির বাস্তবতা ব্যাখ্যা - বিশ্লেষণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে । ফলে এখন কোন একটি সরকারের আলোচনা নয় , বিভিন্ন সরকারের তুলনামূলক আলোচনা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে । এছাড়া বিশ্ব - রাজনীতির পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজনীতির তুলনামূলক আলোচনা নতুন মাত্রা লাভ করেছে — একই সঙ্গে বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নতুন আলোচনা পদ্ধতি , বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গী , নতুন সংজ্ঞা ও গবেষণা পদ্ধতি ও নতুন তত্ত্বগঠনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হচ্ছে । যুদ্ধোত্তর পর্বে তৃতীয় বিশ্বের সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিচার - বিশ্লেষণ এবং প্রয়োজনীয় ও উপযোগী রাজনৈতিক ধ্যান - ধারণা গড়ে তোলা ও এরূপ রাজনীতির বিশেষ উদ্দেশ্য রূপে চিহ্নিত করা যায় । সর্বশেষে উল্লেখ্য যে , রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে তুলনার ভিত্তিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্যের সর্বজনীন উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করাও তুলনামূলক রাজনীতির একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ উদ্দেশ্য ।

Q.তুলনামূলক রাজনীতির প্রকৃতি আলোচনা করো ?

Ans.: তুলনামূলক রাজনীতি হল রাজনীতির একটি বিশেষ শাখা , যার সঙ্গে রাজনৈতিক কার্যাবলী , রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ও ধারণার ব্যাখ্যা , বিশ্লেষণ গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত । এরূপ রাজনীতির আলোচনার পরিধি অধুনা সরকারের আনুষ্ঠানিক আলোচনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে বিভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থা বা অভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়াসমূহের তুলনামূলক আলোচনা করে। তুলনামূলক রাজনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক পরিবর্তন ও প্রগতির পার্থক্য পর্যালোচনা , আর্থ - সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তারতম্য বিচার - বিশ্লেষণ , বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার আকৃতি - প্রকৃতির উপর আধুনিকীকরণের প্রভাব প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা প্রভৃতি । আধুনিক তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনায় কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য , যথা অ্যালমণ্ড ও পাওয়েল , কোলম্যান, পাই প্রমুখ । পরিশেষে এ প্রসঙ্গে তুলনামূলক রাজনীতির কতগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যেতে পারে । যথা— (ক) এরূপ রাজনীতির সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী । (খ) এরূপ রাজনীতি ব্যাপকতর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । (গ) এরূপ রাজনীতি আনুষ্ঠানিকতাকে এড়িয়ে চলে। (ঘ) এক্ষেত্রে বিজ্ঞানমূলক কলাকৌশল অনুসৃত হয় । (ঙ) নতুন ধ্যান - ধারণা ও তত্ত্বের সৃষ্টি এবং বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ । (চ) এরূপ রাজনীতির উপর সামাজিক পরিবেশের প্রভাব বর্তমান । (ছ) তুলনামূলক রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গী হল আন্তঃসামাজিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী । (জ) এই ধরনের রাজনীতিতে মূল্যমান নিরপেক্ষ ধারণার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় ।

Q. তুলনামূলক রাজনীতি ও তুলনামূলক শাসনব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করো ?

Ans.: 'তুলনামূলক রাজনীতি ' এবং ' তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা বা সরকার ' — এই দুটি ধারণা অনেক ক্ষেত্রে অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও উভয়ের মধ্যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্য বর্তমান— যথা , (ক) রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রক্রিয়া তুলনামূলক রাজনীতির এবং আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক কাঠামো তুলনামূলক সরকারের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু । (খ) তুলনামূলক সরকারের আলোচনা বিশেষ বিষয় - কেন্দ্রিক — এখানে কেবলমাত্র সরকারের আনুষ্ঠানিক কাঠামোসমূহের পারস্পরিক তুলনামূলক বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা হয় । কিন্তু তুলনামূলক রাজনীতি হল বহু বিষয়মুখী — এখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা , রাজনৈতিক কাজকর্ম , রাজনৈতিক প্রক্রিয়া প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গেও আলোচনা হয় । Scanned with CamScanner Ve prague (গ) তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনার প্রকৃতি হল বিশ্লেষণমূলক আর তুলনামূলক সরকারের আলোচনার প্রকৃতি হল বর্ণনামূলক । (ঘ) তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনার দৃষ্টিকোণ উদার ও সম্প্রসারিত , কারণ এখানে । পশ্চিমী উন্নত দেশগুলির সাথে সাথে তৃতীয় বিশ্বের পশ্চাদপদ দেশগুলির ক্ষেত্রও প্রসারিত । কিন্তু এদিক থেকে তুলনামূলক সরকারের আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গী সংকীর্ণ , কারণ কেবলমাত্র পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির মধ্যেই এরূপ আলোচনা সীমাবদ্ধ । (ঙ) তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনা অনেকাংশে আন্তঃসামাজিক বিজ্ঞান - বিষয়ক । কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান , মনোবিজ্ঞান , ইতিহাস প্রভৃতি সামাজিক বিজ্ঞান এবং পরিসংখ্যান , গণিত , জীববিদ্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের বিষয়াদিও তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় । কিন্তু এরূপ আলোচনা তুলনামূলক সরকারে অনুপস্থিত । (চ) তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনা মূল্যমান - নিরপেক্ষ । কিন্তু তুলনামূলক সরকারে মূল্যবোধের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় । এ প্রসঙ্গে পরিশেষে উল্লেখ্য যে , বর্তমানে তুলনামূলক সরকারের পরিবর্তে তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে ।

Q. রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনার পদ্ধতি আলোচনা করো ?

তুলনামূলক রাজনীতিতে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বিষয়াদিকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যেই তুলনামূলক পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হয় । রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তিন ধরনের তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়— (ক) নমুনা সমীক্ষা (Case Study) : কোন একটি বিশেষ দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা বিষয় সম্পর্কে নমুনা সমীক্ষা করা হয়ে থাকে । উদাহরণস্বরূপ : রাজনৈতিক দলের কার্য - প্রক্রিয়ার তুলনামূলক আলোচনার কথা বলা যায় । (খ) পারিসংখ্যিক বিশ্লেষণ (Statistical Analysis) : কর্ম পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান , তথ্যাদি ও গাণিতিক হিসাব - নিকাশকে নিয়ে এরূপ বিশ্লেষণ পরিচালিত হয় । পারিসাংখ্যিক গবেষণায় সাধারণ উপাত্তসমূহ বা তথ্যাদিকে বিশেষভাবে জটিল প্রক্রিয়ায় পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে । (গ) পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (Experimental method) : এই পদ্ধতিটি মূলতঃ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা মনোবৈজ্ঞানিক একটি পদ্ধতি । এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য , ফলাফল সম্পর্কে গবেষকের পূর্বধারণা থাকা আবশ্যক । দুটি সমঅবস্থানকারী গোষ্ঠীর জন্য প্রচুর পরিমাণে অবিন্যস্ত তথ্যাদি (variable) । সংগ্রহর মাধ্যমে এই পদ্ধতি কার্যকর করতে হয় । তবে রাজনৈতিক বিষয়ে এই পদ্ধতির প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে ।

Q. তুলনামূলক রাজনীতির তুলনামূলক পদ্ধতি আলোচনা করো ?

— প্রধান বৈশিষ্ট্য পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলক পদ্ধতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করেছেন ডেভিড উড তুলনামূলক পদ্ধতি হল তুলনামূলক রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু । তুলনামূলক রাজনীতির এককের মধ্যে তুলনা করা হয় , তাদের বলা হয় ধারণাগত একক । এই এককগুলিকে সংজ্ঞায়িত করা । (ক) ধারণামূলক এককসমূহের সংজ্ঞা : তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনায় যে সকল বিভিন্ন Scanned withCamiconner মানিক) হয় বা ধারণাগুলিকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় । (খ) বিভিন্ন শ্রেণীকরণ : তুলনামূলক পদ্ধতিতে শ্রেণীকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ক্ষেত্রে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায় । (গ) প্রকল্পমূলক অনুসিদ্ধান্ত গঠন ও তার সত্যতা নির্ধারণ : তুলনামূলক রাজনীতি আলোচনার মূল একক হল রাজনৈতিক ব্যবস্থা , যার ক্রিয়াশীল প্রকৃতি বিচার - বিশ্লেষণ করা তুলনামূলক রাজনীতির কাজ । এরূপ কার্যে বহু ও বিভিন্ন ধরনের মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় । তুলনামূলক পদ্ধতি অনুযায়ী এই সমস্ত প্রশ্নের প্রকল্পমূলক অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং অনুসিদ্ধান্তসমূহের যাথার্থতা যাচাই করা হয় ।

Q. ব্রিটিশ সংবিধানের রীতিনীতি আলোচনা করো ?

ব্রিটিশ সংবিধানের রীতিনীতির গুরুত্ব প্রভৃতি বৈশিষ্ট ও গুরুত্বপূণ ভূমিকা অর্জন করে । সাংবিধানিক রীতিনীতি হল কতগুলি অলিখিত নিয়মকানুন যেগুলি আইন নয় , কিন্তু সাংবিধানিক আইনের মতই তাদের মান্য করা হয় । ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় এরূপ রীতিনীতির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে , যার জন্য এই রীতিনীতিগুলির গুরুত্ব অপরিসীম । প্রথমত : এগুলি শাসনযন্ত্রকে সহজভাবে কাজ করতে সাহায্য করে । যেমন স্থায়ী কমিটির মনোনয়ন সাংবিধানিক রীতি অনুযায়ী স্থির হয় । এটি স্পীকার তথা সংসদকে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে সাহায্য করে । দ্বিতীয়ত : এরূপ রীতিনীতি সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের , যেমন আইনসভার বা রাজপদের , কাজকর্মের নমনীয়তা বজায় রাখতে সাহায্য করে । এগুলি যেহেতু আইন নয় , তাই প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্যবহার করা সম্ভব হয় । যেমন , একটি রীতি অনুযায়ী লর্ডস সভার সদস্যদের বিদেশমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী পদে নিয়োগ করা যাবে না , কিন্তু ১৯৬০ সালে লর্ড হোমের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেছিল — আইন হলে এরূপ ঘটতে পারত না । তৃতীয়ত : এরূপ রীতিনীতি সময়ের প্রয়োজনের সঙ্গে শাসনব্যবস্থায় খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে । কারণ প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সহজে পুরাতন নীতি সংশোধন ও নতুন নীতি প্রণয়ন সম্ভব হয় । প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় সাংবিধানিক রীতিনীতির গুরুত্বের মূল কারণ হল , ব্রিটেনে সংবিধান রচিত হয় নি , বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে । বিভিন্ন সময় পরিস্থিতির চাপে নতুন নতুন রীতি গড়ে উঠেছে এবং তার মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে , আইনের মাধ্যমে সংবিধান পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় নি ।

Q.পুঁজিবাদের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করো ?

Ans.: **সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসের ভিত্তিতে পুঁজিবাদের উদ্ভব :-** পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্ভব হয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গর্ভেই। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটেছে। অর্থাৎ পুরাতন সামন্ত-সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে উঠেছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ইমারত। আগেকার সামন্ত সমাজব্যবস্থার ব্যক্তিগত উৎপাদন থেকেই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়। বুর্জোয়া বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে। এবং মূলত পশ্চিম ইউরোপে এই বিপ্লব সংঘটিত হয়। এবং এই বিপ্লবের সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে সামন্ততন্ত্রের অবসান ও পুঁজিবাদের উত্তরণ সম্পাদিত হয়। সামন্ততন্ত্রের ধ্বংস সাধিত হওয়ায় তার জায়গায় পুঁজিবাদের আবির্ভাব

ঘটেছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন হত কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মাধ্যমে। এই উৎপাদন ব্যবস্থার ধ্বংস সাধিত হয় শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে। শিল্পায়নের ফলে সামন্ততান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থার অবসান ঘটে। আগেকার দরিদ্র কৃষক, ছোটখাট হস্তশিল্পীরা তাদের সাবেকী আর্থনীতিক উদ্যোগ থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়। এবং তারা বৃহদায়তনবিশিষ্ট শিল্প-কারখানায় সামিল হয়। তারা জীবিকা নির্বাহের জন্য শ্রম বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। তারা মজুরি শ্রমিকে পরিণত হয়। এই মজুরি-শ্রমিকদের উৎপাদনের উপর নির্ভর করে উৎপাদন-উপাদানের মালিক হিসাবে মুষ্টিমেয় মানুষ বিপুল বৈভবের মালিক হয়। একে বলে পুঁজির পুঞ্জিভবন। তারফলে সমাজের মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে সম্পদ-সামগ্রী কেন্দ্রীভূত হয়। তারাই হয় যাবতীয় উৎপাদন শক্তির মালিক। এরাই হল পুঁজিপতি।

শক্তিশালী রাজতন্ত্রের বিরোধিতা :- মধ্যযুগে শক্তিশালী বৃহৎ রাষ্ট্র ও স্বাধীন রাজনীতিক কর্তৃত্ব যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে সে ব্যাপারে সামন্ততন্ত্র ও ক্যাথলিক চার্চ সক্রিয় ছিল। অপরপক্ষে চরম ক্ষমতাযুক্ত নৃপতিবর্গ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করতে এবং সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করতে সচেষ্ট হয়। নৃপতিরা শক্তিশালী রাজতন্ত্রের অধীনে জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়। সমকালীন সমাজের শিল্প-বাণিজ্যের মালিক ও ব্যবসায়ীরা এই উদ্যোগকে সমর্থন জানায়। বিরোধী শক্তি সুসংহত ও সবল হওয়ায় সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়।

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব :-সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নতুন উৎপাদন শক্তির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। সমকালীন উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে এই বিকশিত নতুন উৎপাদন শক্তির সামঞ্জস্য সাধন অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা দরকার। সমকালীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সহায়ক পরিস্থিতিতে বৈপ্লবিক অংশগুলির দ্রুত ও বিপুল বিকাশ সম্পন্ন হয়। ভৌগোলিক আবিষ্কার ও নতুন নতুন উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। শিল্পোৎপাদন, নৌ-বাণিজ্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অভাবিত অগ্রগতি ঘটে। উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নতুন উপকরণের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময় নতুন নতুন উৎপাদন কৌশল ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হয়। বাষ্প-চালিত যানবাহনের ব্যবহার শুরু হয়। বিকশিত নতুন উৎপাদন শক্তির কল্যাণে বৃহদায়তনবিশিষ্ট কল-কারখানা স্থাপিত হয়। শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। রাজতন্ত্র- শাসিত ব্যবস্থায় শিল্পের মালিক ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী তাদের উৎপাদন শক্তির বিকাশের স্বার্থে আর্থনীতিক ক্ষেত্রে অধিকতর ও নতুন সুযোগ-সুবিধার দাবিতে সোচ্চার হয়। এই সূত্রে সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এই আন্দোলন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন হিসাবে পরিচিত। পুঁজিপতিদের স্বার্থেই এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে। মার্কস ও এঙ্গেলসের অভিমত অনুসারে ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে সামন্ততান্ত্রিক মালিকানার অবসান ঘটেছে এবং বুর্জোয়া মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মার্কসীয় ব্যাখ্যা অনুসারে নতুন উৎপাদন শক্তির উদ্ভব ও বিকাশ, শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তার, বৃহদায়তনবিশিষ্ট শিল্প-কারখানায় সপ্তায় মজুরি-শ্রমিকের যোগান প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে একেবারে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। এই পরিস্থিতি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে প্রতিকূল প্রতিপন্ন হয়। এবং কালক্রমে সমাজতন্ত্রের অবসান অনিবার্য হয়ে পড়ে।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন :- পুঁজিবাদের উন্মেষ ও বিকাশের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী সত্তার গভীর সংযোগকে অস্বীকার করা যায় না। সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার থেকে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল অধিকতর গতিশীল চরিত্রসম্পন্ন। ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আবির্ভাব ও বিকাশের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের অবদান অনস্বীকার্য। লেনিন-এর অভিমত অনুসারে পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কযুক্ত। তিনি বুর্জোয়া বিপ্লবের পরিণতি হিসাবে জাতীয়তাবাদকে প্রতিপন্ন করেছেন। পুঁজিবাদের আর্থ-সামাজিক কারণ জাতীয় আন্দোলনের মধ্যেও বর্তমান থাকে। জাতীয় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংসের উপর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চূড়ান্ত সাফল্যের কথা বলা হয়ে থাকে। পুঁজিবাদের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল পণ্য-উৎপাদন। পণ্য উৎপাদনের স্বার্থে বুর্জোয়াদের নিয়ন্ত্রণাধীনে দেশীয় বাজারের অস্তিত্ব অপরিহার্য। অর্থাৎ দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার পুরোপুরি পুঁজিবাদীদের দখলে থাকা দরকার। এই বিষয়টির মধ্যেই যাবতীয় জাতীয় আন্দোলনের আর্থনীতিক ভিত্তি বর্তমান। এবং এই কারণেই সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসের উপর পুঁজিবাদের বিজয় ও বিকাশের সমগ্র অধ্যায়টি জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে ইউরোপে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন জাতীয় ধরম ও জাতীয় শাসকের ধারণাকে পরিপুষ্ট করে। এবং তার ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশ ত্বরান্বিত হয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী আন্দোলন :- ধর্মের ক্ষেত্রে সংস্কারের অন্যতম সূচক হিসাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কথা বলা হয়। আবার এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদই আর্থনীতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের পথকে প্রশস্ত করে। এই কারণে বলা হয় যে পুঁজিবাদের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী আন্দোলনের অবদান অনস্বীকার্য। ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে পুঁজিবাদের উদ্ভবের পিছনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ভূমিকার গুরুত্ব স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয়।

পণ্যোৎপাদন :-পুঁজিবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে একটা প্রয়োজনীয় বিষয় হল পণ্যোৎপাদন। পণ্য উৎপাদন পুঁজিবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পুঁজিবাদের বিকাশ পণ্যোৎপাদনের বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কার্ল মার্কসের অভিমত অনুসার পুঁজিবাদের উদ্ভব হয় পণ্যোৎপাদনের পরিণত অবস্থায়। নিজের বা পরিবারের প্রয়োজন পূরণের জন্য ব্যক্তির যে উৎপাদন তাকে পণ্য বলে না। উৎপন্ন দ্রব্য উৎপাদকের প্রয়োজন ব্যতিরেকে যখন অপরের প্রয়োজন পূরণে ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে বলে পণ্য। অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্য (product) বিনিময়ের মাধ্যমে পণ্যে (commodity) পরিণত হয়। সুতরাং মূলত বিক্রয় বা বাজারের জন্য যে উৎপাদন তাকে পণ্যোৎপাদন বলে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উৎপাদকবর্গ এবং এই উৎপাদকের উপর যাদের কর্তৃত্ব বর্তমান সেই সামন্তপ্রভুদের প্রয়োজন পূরণ করা। একে বলা হয় স্বাভাবিক উৎপাদন। সামন্ত সমাজের অবক্ষয় আরম্ভ হওয়ার পর এই স্বাভাবিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভাঙ্গন দেখা দেয়। এবং স্বাভাবিক উৎপাদনের জায়গায় শুরু হয় মুনাফা অর্জনের জন্য পণ্যোৎপাদন। এই পণ্যোৎপাদন হল পুঁজিবাদের মৌলিক লক্ষণ বিশেষ।

শ্রম-শক্তি :-পণ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষের শ্রম হল অপরিহার্য উপাদান। পণ্য উৎপাদনের জন্য মানুষের শ্রম একান্তভাবে আবশ্যক। এবং এই শ্রমের দ্বারাই মূল্য সৃষ্টি হয়। মূল্য আবার দু'ধরনের হয়—ব্যবহার মূল্য ও বিনিময় মূল্য। এখানে যে মূল্যের কথা বলা হয়েছে তা হল বিনিময়-মূল্য। এ মূল্য উপযোগিতাভিত্তিক প্রয়োজন-মূল্য নয়। পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যয়িত 'শ্রম-সময়'-এর ভিত্তিতে বিনিময় মূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় বাজারে শ্রমশক্তিরও বিনিময়মূল্য পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অন্যান্য পণ্যের মতই শ্রম-শক্তিরও বিনিময় মূল্য আছে। এবং এক্ষেত্রেও শ্রম-সময়ের ভিত্তিতেই শ্রম-শক্তির বিনিময় মূল্য স্থিরীকৃত হয়। নিজের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যের অতিরিক্ত শ্রমিক যা উৎপাদন করে তা হল পুঁজিবাদী মুনাফার উৎস। শ্রম-শক্তির মূল্য প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতানুসারে, 'জীবন্ত শ্রমিকের মধ্যেই শ্রম-শক্তির অস্তিত্ব বর্তমান। নিজের জীবনধারণ ও পরিবার প্রতিপালনের স্বার্থে প্রয়োজনীয় পরিমাণে প্রাণধারণের উপকরণ আবশ্যক। জীবনধারণের জন্য এই নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে যতখানি শ্রম-সময় আবশ্যক সেটাই হল শ্রম-শক্তির মূল্য।

লেনিনের অভিমত :-লেনিনের অভিমত অনুসারে পুঁজিবাদের আবির্ভাবের স্বার্থে দু'টি ঐতিহাসিক পূর্ব শর্ত প্রয়োজন। এই দুটি পূর্ব শর্ত হল: (ক) পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থার অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরে কিছু ব্যক্তির হাতে বেশ কিছু অর্থ-সম্পদ সঞ্চিত হওয়া দরকার। (খ) একটি শ্রমিক শ্রেণীর অস্তিত্ব আবশ্যক। এই শ্রমিক শ্রেণী দু'দিক থেকে স্বাধীন হওয়া চাই। (১) ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয়ের ব্যাপারে শ্রমিকরা হবে সকল রকম বাধা-নিষেধহীন। (২) শ্রমিকরা সকল রকম সম্পদের মালিকানা থেকেও মুক্ত হবে। তারা হবে সর্বহারা। নিজেদের শ্রম-শক্তি ব্যতিরেকে তাদের অন্য কোনও ধন-সম্পদ থাকবে না। সুতরাং পুঁজিবাদের উদ্ভবের জন্য দুটি বিষয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। একদিকে থাকতে হবে উৎপাদনসমূহের মালিককে বা পুঁজিপতিকে। এবং অপরদিকে থাকতে হবে শ্রমিকদের। এই শ্রমিকদের জীবনধারণের একমাত্র উপায় হবে পুঁজিপতিদের কাছে মজুরির বিনিময়ে শ্রম বিক্রয় করা। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শ্রমিক কাজ করে। এই কাজের বিনিময়ে শ্রমিক মজুরি পায়। এবং পুঁজিপতির হাতে আসে মুনাফা। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যই হল এই মুনাফা অর্জন করা। এবং পুঁজিপতির এই মুনাফার উৎস হল উদ্বৃত্ত মূল্য।

CC - PS – 05

Q. উদ্বৃত্ত মূল্য ও শ্রমিক শোষণ এর ধারনাটি ব্যাখ্যা করো ?

Ans.: পণ্যের উৎপাদন থেকে মুনাফার উদ্ভব হয়। আবার এই মুনাফা থেকেই জন্ম নেয় পুঁজিবাদ। এই প্রক্রিয়াটি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। পুঁজিপতির মুনাফার উৎস হল উদ্বৃত্ত মূল্য (Surplus Value)। উদ্বৃত্ত মূল্য উদ্বৃত্ত শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট মূল্য। মার্কসের শ্রমের দুটো দিক বা অংশ বর্তমান। শ্রমের এই দুটো দিক বা অংশ হল 'আবশ্যিক শ্রম' বা 'আবশ্যিক শ্রম-সময়' (necessary labour-time) এবং 'উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়' (Surplus labour-time)। শ্রমিক ও তার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য যতটুকু শ্রম আবশ্যিক তা হল আবশ্যিক শ্রম। নিজের ও পরিবারের জীবন-যাপনের স্বার্থে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যের সমান মূল্য সৃষ্টির জন্য শ্রমিককে যতক্ষণ শ্রম করতে হয়, তাকে বলে আবশ্যিক শ্রম সময়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মোট শ্রম-সময় থেকে আবশ্যিক শ্রম-সময় বাদ দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাকে বলে উদ্বৃত্ত শ্রম বা উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়। আবশ্যিক শ্রম-সময়ে শ্রমিক যে মূল্য সৃষ্টি করে তা হল মজুরি মূল্য। অপরপক্ষে যে মূল্য উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ে সৃষ্টি হয় তা হল উদ্বৃত্ত মূল্য। শ্রমিকই এই উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে। কিন্তু উৎপাদনের মালিক বা পুঁজিপতি এর থেকে শ্রমিককে বঞ্চিত করে এবং নিজে তা মুনাফা হিসাবে আত্মসাৎ করে। পণ্য বিক্রী করে যা পাওয়া যায় পুঁজিপতি তার একটা অংশ জীবনধারণের জন্য মজুরি হিসাবে শ্রমিককে দেয়। কিন্তু শ্রমিকের উৎপাদন এর থেকে অনেক বেশী, অবশিষ্ট অংশ মুনাফা হিসাবে মালিকই দখল করে। এইভাবে সৃষ্টি হয় মুনাফা বা উদ্বৃত্ত মূল্যের। শ্রমের ন্যায্য মজুরি থেকে মালিক শ্রমিককে বঞ্চিত করে বলেই সৃষ্টি হয় উদ্বৃত্ত মূল্যের বা মুনাফার। এই উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করাই হল শ্রমিক শোষণের পুঁজিবাদী পদ্ধতি। এবং শ্রমিক-শোষণই হল পুঁজিবাদের মৌলিক লক্ষণ। শ্রমিক শোষণ ও পুঁজিবাদ বহুলাংশে সমার্থক। পুঁজিবাদী প্রথায় অতিরিক্ত মুনাফার লোভে শ্রমিককে শোষণ করা হয়। এই শোষণের কাজে পুঁজিকে ব্যবহার করা হয়। এই প্রক্রিয়াই পুঁজিবাদের আকৃতি-প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ যত বাড়বে শ্রমিক-শোষণও তত বাড়বে। সুতরাং উদ্বৃত্ত মূল্য, মুনাফা ও পুঁজির ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির উৎস হল উদ্বৃত্ত মূল্য। উদ্বৃত্ত মূল্য বা মুনাফাই হল পুঁজিবাদী শোষণ। শ্রমিকদের শ্রমে উৎপন্ন মূল্যের একটি অংশ থেকে পুঁজিপতি শ্রেণী তাদের বঞ্চিত করে। শ্রমিকশ্রেণীকে বঞ্চিত করে পুঁজিপতিশ্রেণী সেই অংশটুকু মুনাফা হিসাবে নিজেই আত্মসাৎ করে। এই পথেই পুঁজিপতিশ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীর উপর তার শোষণ কায়েম করে। এ প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের অভিমত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতানুসারে 'শ্রমশক্তির মূল্য দেওয়া হয়; কিন্তু এই শ্রমশক্তি থেকে পুঁজিপতি যে পরিমাণ মূল্য আদায় করে নেয়, তার তুলনায় সে মূল্য কম। ঠিক এই পার্থক্যটুকুই, এই অবৈতনিক শ্রমটুকুই হল পুঁজিপতির অংশ, অধিকতর সঠিকভাবে সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণীর অংশ।" প্রকৃত প্রস্তাবে মজুরি-শ্রমিক প্রথার মধ্যেই এক নতুন ধরনের দাসত্ব-ব্যবস্থা বর্তমান আছে। এই কারণে অনেকের অভিমত অনুসারে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হল এক ধরনের মজুরি-দাসত্ব ব্যবস্থা।

Q. বর্ধিত হারে পণ্যের পুনরুৎপাদন এবং পুঁজির পাহাড় বলতে কি বোঝো ?

Ans.: পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মুনাফা বা শোষণকে বাদ দিয়ে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। উৎপাদন-উপাদানের মালিক বা পুঁজিপতি-শ্রেণী এই মুনাফা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ-আয়োজনকে অব্যাহত রাখে। এ ধরনের উদ্যোগের অঙ্গ হিসাবে মজুরির হার হ্রাস, শ্রম-সময় বৃদ্ধি, শ্রমের বেগ বৃদ্ধি প্রভৃতি ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়। পুঁজিপতিরা মুনাফা হিসাবে যে উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে, তার একটি অংশ তারা নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যবহার করে ও অবশিষ্ট অংশকে তারা নতুন পুঁজিতে রূপান্তির করে। তারপর পুঁজির মালিক এই নতুন পুঁজিকে মূল পুঁজির সঙ্গে যুক্ত করে। অর্থাৎ এই অবস্থায় পুঁজির মালিক শ্রেণী অধিকতর সংখ্যায় মজুরি-শ্রমিক নিয়োগ করে। তার ফলে পুঁজিবাদী উৎপাদনের পরবর্তী পর্যায়ে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পুঁজিপতিদের পুঁজির পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। এইভাবে পুঁজির পাহাড় গড়ে উঠে। সীমাহীনভাবে বাড়তে থাকে পুঁজির আয়তন। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদনের পরবর্তী প্রতিটি পর্যায়ে বর্ধিত হারে পুনরুৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়। বর্ধিত হারে পুনরুৎপাদনের জন্য অধিকতর পরিমাণে পুঁজির প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজন পুরণের জন্য পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধি করা দরকার। এবং এই কারণেই পুঁজির মালিকশ্রেণী উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ করার পর তার একটি অংশকে নতুন পুঁজিতে পরিণত করে এবং আগের পুঁজির সঙ্গে তাকে যুক্ত করে। তার ফলে পুঁজির সঞ্চয় আবার বৃদ্ধি পায়। পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং বর্ধিত হারে পুনরুৎপাদনের এই চক্রবৎ প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত থাকে।

Q. পুঁজিবাদের আবির্ভাব কি ভাবে ঘটে ?

Ans.: পুঁজির আদি সঞ্চয় শুরু হয়েছে শোষণ-পীড়ন, লুণ্ঠন, বঞ্চনা, বলপ্রয়োগ প্রভৃতির মাধ্যমে। তবে পুঁজির ঐতিহাসিক ভিত্তি হল ব্যবসা-বাণিজ্য। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাতেই বিনিময়ের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি ও পরিধি প্রসারিত হয়। তারফলে বণিক শ্রেণীর সম্পদ-সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বস্তুত বাণিজ্যিক পুঁজি এবং তেজারতি পুঁজি হিসাবেই পুঁজির প্রথম আবির্ভাব ঘটে। এবং ভৌগোলিক বিচারে পুঁজিবাদ প্রথম দেখা দেয় ইউরোপের দেশগুলিতে। পুঁজিবাদের আগমন প্রথম অনুভূত হয় যখন উৎপাদন উপাদানের মালিকশ্রেণী উদ্বৃত্ত সামগ্রী উৎপাদন এবং অধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ব্যাপারে উদ্যোগী হয়। তবে পুঁজিবাদের সাড়ম্বর আবির্ভাব ঘটেছে শিল্পবিপ্লবের পরই। বস্তুত অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

Q. পুঁজিবাদের সংজ্ঞা দাও ?

Ans.: পুঁজিবাদ হল এক বিশেষ সমাজব্যবস্থা। এই সমাজব্যবস্থা চিরন্তন বা শাশ্বত নয়। এই সমাজব্যবস্থা বিকাশ লাভ করে বা গড়ে উঠে। এই সমাজব্যবস্থার গড়ে উঠার ভিত্তি হল পুঁজিপতিদের দ্বারা মজুরি শ্রমিক (wagelabour)-এর শোষণ। পুঁজিবাদের ধারণা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মহামতি লেনিন কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞাই সর্বাধিক প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন: "Capitalism is the name given to that social system under which the land, factories, implements, etc. belong to a small number of landed proprietors and capitalists, while the mass of the people possesses no property, or very little property, and is compelled to hire itself out as workers." fe পুঁজিবাদ বলতে এক বিশেষ সমাজব্যবস্থাকে বোঝায়। এই সমাজব্যবস্থায় জমিজমা, শিল্পকারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির মালিকানা কুক্ষিগত থাকে মুষ্টিমেয় জমিজমার মালিক ও পুঁজিপতিদের হাতে। এবং জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের হাতে কোন সম্পদই থাকে না, বা নামমাত্র কিছু থাকে। এই জনগোষ্ঠী বাধ্য হয় মজুরি-শ্রমিক হিসাবে দিনপাত করতে। সুতরাং পুঁজিবাদ হল শোষণ এবং উৎপাদন শক্তির মালিকানার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এক বিশেষ ধরনের সমাজব্যবস্থা। শোষণ ব্যতিরেকে পুঁজিবাদের অস্তিত্ব অসম্ভব। মজুরি শ্রমিকদের শোষণ করে উৎপাদন শক্তির মালিকরা। পুঁজিবাদে যে শোষণের কথা বলা হয় তার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে মজুরি-শ্রমিক ও উৎপাদন শক্তির মালিকানা। অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় একদিকে থাকতে হবে উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিক। এদের বলা হয় পুঁজিপতি। এরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। আর এক দিকে থাকতে হবে জনগণের গরিষ্ঠ অংশ। এদের জীবিকার একমাত্র উপায় হল মজুরির বিনিময়ে পুঁজিপতিদের কাছে শ্রম বিক্রয় করা। এদের বলা হয় মজুরি-শ্রমিক।

একটি উৎপাদন পদ্ধতি :- প্রকৃত প্রস্তাবে পুঁজিবাদ বলতে বিশেষ এক উৎপাদন পদ্ধতিকে বোঝায়। এই উৎপাদন পদ্ধতিতে পুঁজিই হল উৎপাদনের প্রধান উপায়। তবে এই পুঁজি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। শ্রম ক্ষমতা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় উপকরণ যা দিয়ে ক্রয় করা যায় তাই পুঁজি হিসাবে পরিগণিত হয়। সুতরাং টাকাকড়ি, ধার দেওয়ার মত কোন সামগ্রী, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি পুঁজি হিসাবে গণ্য হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজির ব্যক্তিগত মালিকানা ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর হাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ এই মালিকানা থেকে বঞ্চিত থাকে। এমিল বার্নসও একটি উৎপাদন প্রথা হিসাবে পুঁজিবাদের কথা বলেছেন। লেনিন পুঁজিবাদের দুটি মূল বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। এই দুটি বৈশিষ্ট্য হল শিল্পের ব্যাপক বিস্তার ও বৃহদাকারবিশিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন। পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিতে পণ্য ও উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হয়, অবিরাম পুঁজির সঞ্চয় ও সঞ্চালন ঘটে এবং পুঁজিবাদী সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পুঁজিবাদী সম্পর্ক বলতে শ্রমিক শোষণ ও মুনাফা ভোগকে বোঝায়।

আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও আন্দোলন : - আবার পুঁজিবাদ একটি অর্থব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা হিসাবেও পরিগণিত হয়। মানবসভ্যতার ইতিহাসের একটি স্তরের আর্থনীতিক ও সামাজিক রূপ হল পুঁজিবাদ। অনেকের অভিমত অনুসারে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন পদ্ধতি ও ভাবধারার ক্ষেত্রে